ছাত্ররাজনীতি বনাম লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি

এম সাখাওয়াত হোসেন

২০ অক্টোবর ২০১৯, ১২:৫৩
আপডেট: ২০ অক্টোবর ২০১৯, ১২:৫৬

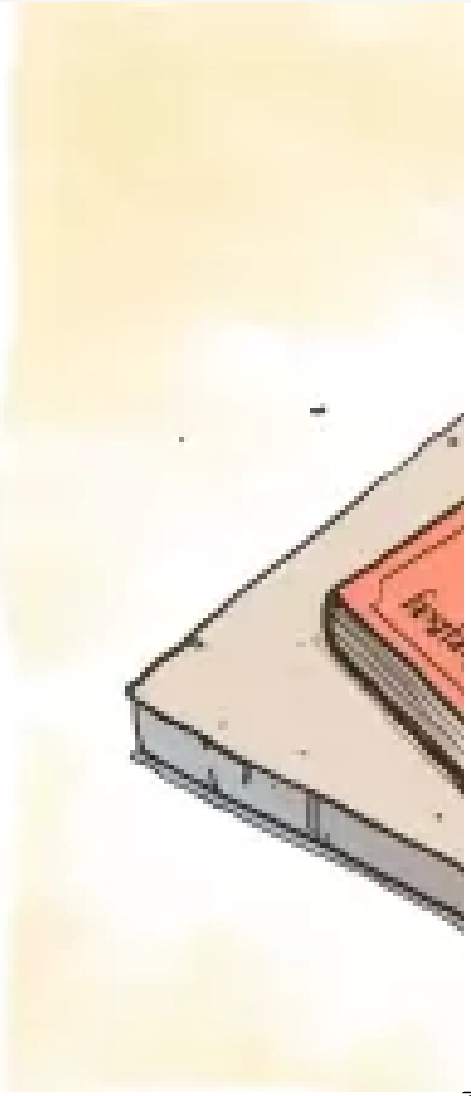

বুয়েটের ছাত্র আবরারের নৃশংস হত্যা নিয়ে সোচ্চার রয়েছেন বুয়েটের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা, যদিও এর মধ্যেই এ পর্যন্ত ১৮ জনকে এ হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হিসেবে আটক করা হয়েছে। আবরারের দু-একজন সহপাঠী দোষ স্বীকার করে যে জবানবন্দি দিয়েছেন, তার বিবরণ লোমহর্ষক এবং অত্যন্ত নৃশংস মধ্যযুগীয় পন্থা। এ ধরনের হত্যার তুলনা

বিরল।

এ হত্যা নিয়ে উত্তাল ছিল বুয়েট, যা এখন অনেকটা প্রশমিত হলেও আন্দোলন চলমান। তাঁদের দাবি এবং আলটিমেটাম অনেকখানি কাজ করেছে। কারণ, তাঁরা দলহীন সাধারণ ছাত্রছাত্রী। যাঁরা আবরার হত্যার সঙ্গে প্রাথমিকভাবে শনাক্ত ও জড়িত, তাঁদের সবাই ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের হলের কথিত কর্তৃত্বধারী শীর্ষ পর্যায়ের পদাধিকারী।

আবরার হত্যার পরপর এর কারণ হিসেবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা না থাকার বিষয়টি সামনে উঠে আসে। আবরার ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে তাঁর মতামত প্রকাশের কারণেই নির্যাতন ও খুনের শিকার হয়েছেন বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। এ কারণে জাতিসংঘের স্থানীয় প্রধান ও যুক্তরাজ্যের দূত বিবৃতি দিয়েছিলেন, যা সরকারকে বিব্রত করেছে। বিব্রত হওয়ারই কথা, কারণ ২০১৪ এবং ২০১৮-এর নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেমন বিতর্ক রয়েছে তেমনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিক জায়গা না দেওয়া এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতাসহ অন্যান্য সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান নেমে যাওয়ার বিষয়গুলো বিব্রতকর। হত্যাকারীরা ঘটনাটিকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ধারণা দেওয়া হয়েছিল যে আবরার জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ছাত্রশিবিরের সদস্য। শিবির সদস্য বলেই ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে গিয়ে হত্যা করা হয়। তবে এ ধরনের অভিযোগ ধোপে টেকেনি। তবে শিবির এখন পর্যন্ত কোনো নিষিদ্ধ সংগঠন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, শিবির সন্দেহে পুলিশই বা কেন ধরপাকড় করছে!

উল্লেখ্য, দেশের আইনমতে জামায়াত ও ছাত্রশিবির দুটি সংগঠনই বৈধ এবং সরকার এখনো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি। মূল দলের বৈধতার প্রশ্নে আদালতে মামলা রয়েছে বলে তথ্য থাকলেও তার অগ্রগতি নিয়ে তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। জামায়াতে ইসলামীকে শুধু নির্বাচন থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের মাধ্যমে। একটি দলের নির্বাচনের জন্য রেজিস্ট্রেশন না থাকা ওই দলকে নিষিদ্ধ করে না।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল গঠন করতে বা পরিচালিত করতে কোনো রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনও হয় না এবং বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকে না। দল গঠন করে ঘোষণা দিলেই হয়। যত দিন পর্যন্ত সরকারি আইন বা আদালত দ্বারা কোনো দল নিষিদ্ধ না হয়, সে দল কার্যত সক্রিয় দল হিসেবেই কার্য পরিচালনা করে থাকে। ফলে এই প্রশ্ন খুবই সংগত যে, কোনো ব্যক্তি শিবিরের বা জামায়াতের সদস্য হলে, শুধু এই কারণেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা কোন আইনে সিদ্ধ?

এ হত্যার পর যে বিষয়টি বহু প্রশ্ন ও তর্ক-বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, তা হচ্ছে ছাত্ররাজনীতির ভবিষ্যৎ। বিশেষ করে লেজুড় বলে পরিচিত রাজনৈতিক দলগুলো সমর্থিত ছাত্রসংগঠনগুলো রাজনৈতিক পরিচয়ে থাকা উচিত কি না। গত সপ্তাহে সুজনের সভাপতি বদিউল আলম মজুমদার তাঁর প্রবন্ধে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এরপরও ২০০৮ সালের আরপিওর সংস্কারের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে এবং বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায়

কিছু বিষয় তুলে ধরছি। ওই সময়ে এবং অনেক রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ এবং শিক্ষক সমিতি এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে বিভিন্ন দল দ্বারা পরিচালিত ছাত্রসংগঠনের অবস্থান দলীয় গঠনতন্ত্রে কী হবে, তা নিয়ে গভীর আলোচনা হয়। ছাত্রসংগঠন ছাড়া পেশাজীবীদের নিয়ে অঙ্গসংগঠন তৈরি এবং দল কর্তৃক পরিচালনার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়।

ওই সময় অংশগ্রহণকারী প্রায় সব রাজনৈতিক দল নীতিগতভাবে মূল দলের সাংগঠনিক কাঠামো থেকে ছাত্র এবং পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে অঙ্গসংগঠন হিসেবে বাদ দিতে রাজি হয়। সিদ্ধান্ত হয় ওই সব সংগঠন নিজস্ব গঠনতন্ত্র ও প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হবে, যা আরপিও ১৯৭২, ধারা ৯০বি (১) (খ) (iii) তে এবং এর প্রভিশনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে আরপিওর এই ধারা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় সংসদে পাস হয় এবং আইনে পরিণত হয়। এসব আইন প্রণয়নে অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা করা হয়েছিল যে দেশের বৃহৎ দুটি দল আরপিওর এই আইন মেনে এ ধরনের সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না। কিন্তু তেমনটি হয়নি। ২০০৯ সালে নির্বাচনের পরপর ছাত্রলীগের কাউন্সিল অধিবেশন হয়তোবা অন্য কোনো কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিকে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাকা হয়েছিল। ওই সময়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ব্যাখ্যা চাইলে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে আওয়ামী লীগের প্রধান আমন্ত্রিত হওয়ায় যোগ দিয়েছেন, তার বাইরে কিছুই নয়। এরপর আর এমন থাকেনি বরং দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা আরও ঘনীভূত হয়েছে। এখানে বিএনপি, আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদল এককাতারে।

বাস্তবে আরপিওর আইনটি প্রয়োগের অভাবে একপ্রকার অকার্যকর হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এই আইনের আনুষ্ঠানিক প্রয়োগকারী সংগঠন। তাদের পক্ষে কোনো পদক্ষেপ অতীতেও দেখা যায়নি। ভবিষ্যতেও দেখা যাবে, এমন মনে হয় না। এই আইন প্রয়োগে শুধু নির্বাচন কমিশনই নয়, যদি রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে সরকারি দল উদ্যোগ না নেয়, তবে প্রয়োগ করা কঠিন। এই ধারা পরিবর্তনের তেমন উদ্যোগ এখনো দেখা যায়নি। তবে এ আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য দলের চেয়ে সরকারি দলের দায়িত্ব বেশি। নির্বাচন কমিশন আইন প্রয়োগের কতখানি ক্ষমতা রাখে, তা অনুমেয়। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন সাদা-কালো আইনে শক্তিশালী হলেও প্রায়োগিক দিক থেকে এই উপমহাদেশের সবচেয়ে দুর্বল সংগঠন এবং প্রতিনিয়তই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। কাজেই নির্বাচন কমিশন এমন ক্ষমতাধর সরকারি দলের বিপরীতে যেতে পারবে কি না, সন্দেহ রয়েছে।

বাংলাদেশে যে দুটি দল ক্রমান্বয়ে ক্ষমতায় এসেছে, তাদের ছাত্রসংগঠন হল দখল থেকে শুরু করে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ইত্যাদিতে লিপ্ত থেকেছে। তবে এ অবস্থা দিন দিন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে, যার উদাহরণ কত বীভৎস হতে পারে, তা বুয়েটের ঘটনায় জনসমক্ষে এসেছে। বর্তমান সরকার লাগাতার ক্ষমতায় থাকায় কথিত অঙ্গসংগঠন অথবা ছাত্রলীগের মতো সহযোগী সংগঠনগুলো দলের চেয়ে শক্তিধর হতে দেখা গেছে। ছাত্রসংগঠনের এহেন আচরণের কারণে সাধারণ ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে, এমন তথ্য প্রতিনিয়ত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমেই সাধারণ মানুষও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এর প্রতিকার অবশ্যই প্রয়োজন।

বুয়েটের আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের দাবি অনুযায়ী ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা নীতিগতভাবে কর্তৃপক্ষ মেনে নেওয়ার পর রাজনৈতিক তথা ছাত্রসংগঠনগুলো বেশ অস্বস্তিতে রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ছাত্রগোষ্ঠী, ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদল একত্রে এর বিরোধিতা করেছে বলে তথ্যে প্রকাশ। অনেক রাজনীতিবিদ একে 'বিরাজনীতিকরণ' করার প্রক্রিয়াও বলে বক্তব্য দিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা আইনগতভাবে বিষয়টির প্রতিকারের কথা একবারের জন্য উচ্চারণ করেননি।

প্রশ্ন উঠেছে, ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হবে কি না। সেটা বলা কঠিন। তবে লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি বেআইনি। তাই ছাত্রসংগঠনের রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলো থেকে ছাত্রসংগঠনগুলোকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। একই সঙ্গে প্রতিটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান জরুরি।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংকটের কোনো উন্নতি দৃশ্যমান নয়। এরই মধ্যে ছাত্ররাজনীতির নামে এ ধরনের পরিস্থিতি শুধু রাজনৈতিক অঙ্গনেই নয়, সমাজের মধ্যে অস্থিরতার জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে, ছাত্রদের সংগঠনের লেজুড়বৃত্তির শিকার সম্পূর্ণ শিক্ষাঙ্গন। এ পরিস্থিতির উন্নয়ন না ঘটালে বাংলাদেশের সব অর্জন ম্লান হয়ে যাবে। সব দলের সম্মতিতে ছাত্র ও পেশাজীবীদের সংগঠনের ব্যাপারে যে আইন প্রণীত হয়েছে, সেই

আইনের যথাযথ প্রয়োগ বর্তমান পরিস্থিতি থেকে কিছুটা পরিত্রাণ দিতে পারে। অন্য কারও স্বার্থে না হলেও সরকারি দলের উচিত নিজের স্বার্থে আইন মেনে ছাত্র ও পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে দলীয় সম্পৃক্ততা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করা। তা না করতে পারলে দেশের ভবিষ্যৎ মেধাবী প্রজন্মের অপচয় ও অবক্ষয় ঘটতেই থাকবে। যেমন হয়েছেন খুনের সঙ্গে জড়িত বুয়েটের ২০ জন মেধাবী ছাত্র। তাঁরা অপরাজনীতির বলি।

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন: সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক সামরিক কর্মকর্তা, বর্তমানে এনএসইউর অনারারি ফেলো

hhintlbd@yahoo.com